রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে নারী

মাসুদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবসঞ্চারী লেখক। জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যে মাত্রা দান করেছেন, তা অতুলনীয়। সার্বিকভাবে তাঁর মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য আধুনিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং জীবনকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সমস্ত পৃথিবী এবং ভারতবর্ষে তখনই প্রবলভাবে আধুনিকতার ঢেউ এসে লাগে। নতুন কালের মানুষ নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও এর দ্বারা একদিকে আন্দোলিত, অন্যদিকে বিচলিত বোধ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিশেষ করে নারীর অবস্থা ও চরিত্রচিত্রণের বিষয়টি এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রথমেই যা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা হলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস ও গল্পে যে নারী-পুরুষের কথা বলেছেন তারা সেকালের নর-নারী নয়, একালের নারী-পুরুষ। নতুন ভাবনা নতুন চিন্তার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাদের নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারীরই প্রাধান্য, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসগুলোতে নারীকেন্দ্রিক সমাপ্তিই লক্ষ করি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোও নারীকেন্দ্রিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীকে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রগুলো সেখানে আত্মপ্রত্যয়, আত্মগরিমায় উজ্জ্বল। এই প্রেক্ষাপটে আমরা রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট নারীচরিত্র বিষয়ে আলোচনা করব। *চোখের বালি* (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক আধুনিক সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের মাধ্যমে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নতুনত্ব সঞ্চার করেছিলেন তিনি বাংলা উপন্যাস মাধ্যমে। বাল্যবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী— দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের মনোদৈহিক চাহিদা ও সংকটের সমস্যা কীভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হলো, বাঙালি সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আঘাত দিলেন, তার এক বিচিত্র, বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।[১] এছাড়াও

[১] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,' মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৯

নারীর মধ্যে যে বক্তিত্বের কল্পনা করতেন তিনি, এই উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

এই উপন্যাসে বিনোদিনী বাদেও আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র রয়েছে, তারা হচ্ছেন প্রধান পুরুষচরিত্র মহেন্দ্র-র মা রাজলক্ষী, মহেন্দ্র-র কাকি অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্র-র স্ত্রী আশালতা। এই নারীচরিত্র তিনটি বাঙালি সমাজে মা, কাকি আর স্ত্রী যেমন হয় ঠিক তেমনিভাবে অঙ্কিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তবে বিনোদিনী চরিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি চরিত্রের মধ্যেও বাঙালি জীবনের প্রচল ধারার বাইরের দ্বন্দ্বমূলক ব্যক্তিত্বের আরোপ করেছেন। এদের মুখের ভাষা, চিন্তা ও চিন্তার বিন্যাসও রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে করেছেন। এই চরিত্রগুলো অনুধাবনে *চোখের বালি*-র উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

১.

রাজলক্ষী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শোনো ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?"

কাকী [অন্নপূর্ণা] কহিলেন, "এ তোমার বাছা বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জাবোধ হয়।"

একথা রাজলক্ষীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে কটি কথা বলিলেন তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, "আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজোবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।"

রাজলক্ষী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজোবউ কহিলেন, "তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এত দিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।"

মেজোবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। [...]

২.

আশা দেখিল, বিনোদিনী সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণ— প্রভুত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ, স্বভাবসিদ্ধ— দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে লেশমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যখন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল তখন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চারগুণ উছলিয়া পড়িল।

জাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এসো ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কী পাতাইবে।"

আশা গঙ্গাজল বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল।

বিনোদিনী কহিল, "ওসব পুরনো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই।"

আশা কহিল, "তোমার কোনটা পছন্দ।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "চোখের বালি।"

শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "চোখের বালি।"

বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। [...]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকেই 'বিনোদিনী' চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা অনুধাবন করা যায়— রাজলক্ষী, অন্নপূর্ণা আর আশার চরিত্র থেকে। বন্ধুত্ব পাতানোর ক্ষেত্রে বিনোদিনী যে নতুন ধারণা নিয়ে আসে, এও রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীর এক নতুন বৈশিষ্ট্য। 'গঙ্গাজল', 'বকুলফুল' এই সব প্রচল পবিত্র ধারণা ভেঙে দিয়ে বিনোদিনী 'চোখের বালি'— এই ধারণার মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ মিষ্টি-মধুর-তেতো এক ভাবসঞ্চার করল— যা তৎকালীন সময়ে একদমই নতুন বিনির্মাণ। তাই নিঃসংকোচে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙালি নারীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সৃষ্টি হলো।

লক্ষণীয়, *চোখের বালি* উপন্যাসে 'বিনোদিনী', 'রাজলক্ষী' আর 'আশাপূর্ণা'— এই তিন নারীচরিত্রই বিধবা। এমনকি উপন্যাসও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এদের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের কেন এই ভাবনা ও তার সৃষ্টি? এমনটি হতে পারে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও আপত্তিতে বিধবাদের পুনরায় বিবাহকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করতে না-পারলেও বিধবাদের দুঃখকষ্ট তিনি প্রত্যক্ষ করে কষ্ট পেয়েছেন, তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিধবাদের পুনরায় বিবাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁকে উদ্বেল করে রেখেছিল নিঃসন্দেহে। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের গোপন ইচ্ছা দিবালোকের মুখ দেখল। তাই বাস্তবে তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন বাল্যবিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেও বিধবা-বিবাহ আইনানুগ বৈধতা পেলেও বিধবাদের সামাজিক অবস্থান, অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি বিষয়গুলো উপেক্ষিত ছিল। তাই নিজপুত্রের সঙ্গে বাল্যবিধবার বিবাহ দিয়ে যেমন সাহসিকতার কাজ করেছেন তিনি, তেমনি সমাজজীবনের এই সংকটটি নিয়ে উপন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি করে দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন। এজন্য তৎকালে তিনি যেমন প্রশংসিত, তেমনি সমালোচিতও হন।

রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*র নায়িকা বিনোদিনী সুন্দরী এবং বিধবা। "বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল।" এই বিনোদিনী রাজলক্ষীর বদান্যতায় সেই মা ও ছেলের সংসারে এসে উপস্থিত হলো। বিধবাসূত্রে যে সংসারে আসা তার অতীতের একটা সময়ের ভবিতব্য ছিল। সেই সুখের

সবটুকু আত্মসাৎ করে বসে আছে নেহাতই নিরীহ, গোবেচারা, আশা নামের একটি বালিকা। বিনোদিনীর এতদিনকার আত্মপীড়ন, নিঃসঙ্গতার বেদনাবৃত্তে সমর্পিত মন এই পরিবেশের সান্নিধ্যে সমস্ত ছদ্ম প্রচ্ছদ খুলে ফেলে অহং ও মর্যাদাবিজড়িত প্রেমানুভূতির গৌরবে অভিষিক্ত হতে চাইল।[২] তার অনেকদিনকার উপবাসী যৌবন সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে বলল :

> এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিসিমার ঘরে থাকি তখন কোন ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আসে না। এত ঔদাসীন্য কিসের! আমি কি জড় পদার্থ। আমি কি মানুষ না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইতো; তবে আদরের চুনির সাথে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।

রবীন্দ্রনাথও বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিধবা বিনোদিনীর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব আর ক্ষুব্ধ অহংকারী চেতনার প্রকাশ ঘটান এভাবে :

> ১.
>
> একটু জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের না দুইয়ের মিশ্রণ বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক আর দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষবিদ্ধ বিষ কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল; সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।
>
> ২.
>
> বিহারী চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোনো উত্তর না দিয়া চিঠি ফেরৎ পাঠাইয়াছে মনে করিয়া বিনোদিনীর সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরা দব্ দব্ করিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে। ক্ষুব্ধ বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্রের জীবনাগ্রহ, সূক্ষ্ম আত্মসজাগতা, মর্যাদাবোধ, শ্রদ্ধাজনিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জটিল রূপরেখাটি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বিধবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোজগতের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর চরিত্রের মধ্যে অহংচেতনা ছাড়াও প্রেম, কাম, রস ও সৌন্দর্যবোধের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন চমৎকার নৈপুণ্যে :

> অপরাহ্ণে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামীসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক-একদিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, "আঃ, আর একটু বোসোই না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ামৃগ নন,

[২] সুস্মিতা সোম, 'রবীন্দ্রভুবনে পরম-প্রেম-প্রকৃতি', এম এস পাবলিকেশন, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা বইমেলা, ২০০৯, পৃ. ১৯২

> তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ। ... "আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না—তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো।"
>
> কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল—কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে।— 'এমন সুখের ঘরকন্না! এমন সোহাগের স্বামী! এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ ঘরের এই দশা, এ মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।

বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর অবদমিত কামবাসনা আর প্রেম চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি নিজের পছন্দের পুরুষকে পুরোপুরি জয় করবার ভাবনাও ধরা পড়েছে। এই নারী, কোনো সন্দেহ নেই একেবারে নতুন কালের আত্মপ্রত্যয়ী নারী। এরকম আত্মপ্রত্যয়ী নারীর বিপরীতে বরং মহেন্দ্র আর বিহারীকে নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী এই বিনোদিনীর পরিণাম রচনা করতে গিয়ে প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে বিস্মৃত হলেন না।[৩] অর্থাৎ এই নারীও পরিণামে মহেন্দ্র আর বিহারীকে অস্বীকার করে একক জীবন বেছে নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, কাউকেই সে বিয়ে করে নি। এই উপন্যাসের উপসংহারে বিনোদিনী তাই বলে :

> ছি ছি, একথা মনে করতে লজ্জা হয়, আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লজ্জিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না।... তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন, আজও তুমি তাই থাকো, আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও তুমি সুখী হও।

মহেন্দ্র তাই ফিরে গেল আশার কাছে। বিহারী একাকী হলো। জীবনের উত্তাপহীন সংযম নারী হিসেবে বিনোদিনীকে সমাহিত করল যেন। আমরা পেলাম রবীন্দ্রসাহিত্যে অনন্য এক নারীর দেখা।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাস রচনা করলেও এখানে তিনি নারী-স্বাধীনতা ও অধিকার-বিষয়ক তাঁর কিছু জিজ্ঞাসার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি জিজ্ঞাসাই ছিল যে, সমাজ বিশেষ করে সংসারে স্বামী যদি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় জীবনাচরণের ক্ষেত্রে, সেই অধিকার বহন করার জন্য নারী কতখানি প্রস্তুত। কারণ মেনে নেয়া বা মানিয়ে নেয়ার চাইতেও অনেক কঠিন কাজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজস্বতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। এই জিজ্ঞাসা থেকেই রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* উপন্যাস।[৪]

এই উপন্যাসে প্রধান তিনটি চরিত্র বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ। নিখিলেশের শান্ত সংযত জীবনাদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পাতিব্রত্য হঠাৎ বাধা পেল স্বদেশসেবী বলে পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগ-উন্মত্ত সন্দীপ দেশ সেবকের ছদ্মবেশে বিমলার শান্ত প্রসন্ন মনটিকেও উত্তেজিত করে তুলল। সন্দীপের প্রচণ্ড আবেগের

---

[৩] সৈয়দা নাজনীন আখতার, "প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : জেন্ডার ও নারীবাদী পাঠ"। দ্র. সেলিনা হোসেন, [সম্পাদিত] 'সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মার্চ ২০০৭, পৃ. ২৮৮

[৪] সুস্মিত সোম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

পিচ্ছিল মত্ততায় বিমলাও কিছুটা স্খলিত হয়ে পড়ে। সন্দীপ 'বন্দে মাতরম্' বলে তার (বিমলার) মন ভোলাতে চাইলেও আসলে সে নারীরূপকেই লালসার দৃষ্টিতে বন্দনা করেছে। শেষ পর্যন্ত স্বামী নিখিলেশের ধৈর্য ও মহানুভবতায় বিমলা নিজের আবিল অবস্থাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে উদার বিশ্বের বৃহত্তর পটভূমিকায় আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, ঘরের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎও তাকে আমন্ত্রণ করে নিল।[৫]

এই উপন্যাসে বিমলা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী এক নারী। বিমলার এই বিশ্বাস ও চেতনা নির্মাণে তার স্বামী নিখিলেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসে নিখিলেশ বিমলাকে বলে :

> তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হও নি, আমিও হই নি, সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের মধ্যে আবহমান বাঙালি নারীর রূপ যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি বিমলার মধ্যে আধুনিক নারীর প্রতিরূপও নির্মাণ করেছেন। মূলত এই দুই ধারার মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে 'বিমলা' চরিত্রটি বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে আমাদের সাহিত্যে প্রাগ্রসর নারীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রে আবহমান বাঙালি নারীর রূপ তুলে ধরেন এভাবে :

> মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত, আমার সিঁথির সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কী বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, অমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আবার বিমলার মধ্যে আধুনিক নারীর ভাবনা উঠে আসে এভাবে :

> ১.
>
> এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়। পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রী পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।
>
> ২.
>
> আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম। তাই, মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী

[৫] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

> মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে?

রবীন্দ্রনাথ বিমলা চরিত্রের মধ্যে পাতিব্রত্য, আধুনিক নারীর মনন সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি তাতে কামনা মত্ততা ও প্রবৃত্তিতে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতাও সৃষ্টি করেছেন। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিমলা চরিত্রটি এতই আধুনিক নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ যে, সুদর্শন আদর্শ প্রেমময়ী স্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় পরপুরুষ সন্দীপে আসক্ত হলো। নারীর এই রূপ বাংলা সাহিত্যে এমনভাবে রবীন্দ্রনাথের আগে এত সার্থক করে তুলতে পারেন নি কেউ। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির প্রয়োগের কারণেই বিমলা এতটা আধুনিক। পরপুরুষ সন্দীপের প্রতি তার আকর্ষণ দেহগত নয়, মানসিক ও দর্শনগত—এও বিমলা চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কারণেই। বিমলা চরিত্রের সন্দীপের প্রতি মানসিক ও দার্শনিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন এভাবে :

> ...কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত। তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিনী। তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বারবার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষের রূপে দেখা দেন। তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি; যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-এক দিন গান ধরতেন—
>
> যখন দেখা দাও নি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
> এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
> তখন নানা তানের ছলে
> ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
>
> এখন আমার সকল কাঁদা বাধার রূপে উঠল হাসি। এই সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছু স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি। নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎটাকে; আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁওয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না; আর, মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে, ঐ আমার ভক্তকে—ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি।

এভাবে সন্দীপের মনগড়া স্তুতিবাক্যে আচ্ছন্ন হয়ে বিমলা তাকে নিয়ে গভীর উপলব্ধির জগৎ তৈরি করে এবং একটা পর্যায়ে নিখিলেশের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় বিমলা। কিন্তু বাঙালি নারীর আদর্শ রূপও ধরে রাখতে চাইলেন বিমলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। বাইরের জগতে বিমলা প্রতিষ্ঠা পেলেও, ঘরের বন্ধন যে আরো সত্য—"জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু কি সে নষ্ট হবার?"—বিমলা ফিরে আসে নিখিলেশের কাছে।

নারীশিক্ষা, স্বাধীনতা আর অধিকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এই বিমলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাস সূক্ষ্ম বনেদি আভিজাত্যবোধ এবং উঠতি ধনীর অর্থের স্থূলতর কাহিনি। এ কাহিনিতে মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে। হঠাৎ ধনাগমে স্ফীত শিক্ষাসংস্কৃতি-বিবর্জিত মধুসূদন মার্জিত আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তিঘরের স্নিগ্ধ মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল। একদিকে কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজ বিপ্রদাসের স্নিগ্ধমধুর আভিজাত্যমণ্ডিত প্রভাব, আর একদিকে স্থূলরুচির মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন[৬]—এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মধ্যে চমৎকারভাবে কুমুদিনী বা কুমু চরিত্রকে তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমু, যাকে রবীন্দ্রনাথ একটু একটু করে সৃষ্টি করেছেন শুদ্ধতম অনুভূতির কোমলতম মাধুরী দিয়ে। কুমু "দেখতে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড, চোখ বড় না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটা বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব।"

কুমুর সৌন্দর্য, শুদ্ধতা, তেজস্বিতা আমাদের যেমন মুগ্ধ করে; তেমনি আর্থিক বিপর্যয়ে ক্রমাগত তলিয়ে যাওয়া দাদার সংসারে উনিশ বছরের কুমারী কন্যার অবস্থান কতটা নড়বড়ে সে উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথ উন্মোচন করেন কুমুর এক ধরনের অপরাধবোধে পীড়িত ভাবনা থেকে।[৭] রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে চারদিকে দেখছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো-দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি।

কুমু চরিত্রের এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক সনাতন নারীর চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু কুমু চরিত্র কেবল সনাতন নারীর নয় তার মধ্যে যুগপৎ আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর চেতনাও বিদ্যমান। দাদা বিপ্রদাসের নিয়ত সাহচর্যে গড়ে উঠেছিল তার শিক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধ। 'রঘুবংশ', 'নলদময়ন্তীর উপাখ্যান', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলার কাহিনী' তার মনে যেমন সতীত্বের এক আদর্শলোক তৈরি করেছিল, তেমনি

---

[৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

[৭] দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, "যোগাযোগ : কুমুরগান"। দ্র. আবুল হাসনাত, [সম্পাদক] 'কালি ও কলম', সপ্তম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, খিলক্ষেত, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ১৫৩

গড়ে তুলেছিল আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা।[৮] যেমন, মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে বিয়ে স্থির হবার পর কুমু নিজেকে সনাতন নারীর রীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করতে লাগল মনে মনে :

> তিনি ভালোই হোন, মন্দই হোন, তিনি আমার পরম গতি। সতীধর্মের এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখ-দুঃখের অতীত, তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা আবশ্যকতা কিসের। অনুরাগে চাওয়া পাওয়ার হিসাব থাকে। ভক্তি আরও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক। স্বামী নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন।

কিন্তু কী হলো বিয়ের পর। বিয়ের পরদিন রাত্রে কুমুর অসহায় ভীত ভাব দেখতে দেখতে 'মোতির মা যেন এক বিভীষিকার ছবি দেখতে পেল, যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত বাসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।' যে পতিকে সে বাস্তবে লাভ করে তার মধ্যে তার আশৈশব গড়ে তোলা ধ্যানমূর্তির কোনো উপাদানের অস্তিত্ব নেই, অন্তরে বাহিরে কোনো মিলই নেই তার সঙ্গে। দিনের বেলায় এই সংসার কুমুর কাছে স্বামীর দাসীত্বই কেবল প্রত্যাশা করে। এবং রাত্রি যত গভীর হয় ততই স্বামী 'মধুসূদনের ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।'[৯] এই তার পতি। তাই অনিবার্যভাবেই শিক্ষিতা, সুন্দরী, তেজস্বী আর অভিজাত রুচির কুমু প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ করেন এভাবে :

> এমন সময়ে বাহিরে মচ্ মচ্ শব্দে মধুসূদন আসছে। মোতির মা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মধুসূদনের কাঁচের কাগজচাপা হাতে করে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখলে। তারপরে নিশ্চিত-প্রত্যয়ের কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "হাবলু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি করে নিয়েছিল। জিনিসপত্র সাবধান করে রাখতে শিখো।"
>
> কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "ও চুরি করে নি।"
>
> "আচ্ছা, বেশ, তা হলে সরিয়ে নিয়েছে।"
>
> "না, আমিই ওকে দিয়েছি।"
>
> "এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসি নে।"
>
> কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?"
>
> মধূসূদন বললে, "হ্যাঁ নিয়েছি।"
>
> "তাতেও তোমার ঐ কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হল না?"
>
> "আমি তো বলেছিলুম, ওটা তুমি রাখতে পারবে না।"
>
> "তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?"

---

[৮] দেবী মুখোপাধ্যায়, "আমি নারী, আমি মহীয়সী—কিন্তু সতীত্ব! প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ"। দ্র. তরুণ ভট্টাচার্য [প্রধান সম্পাদক], 'পশ্চিমবঙ্গ', বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪-৮, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, অগাস্ট ১৯৯৬, পৃ. ১৯৪

[৯] পূর্বোক্ত, পৃ, ১৯৪

"এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইল তোমার এই ঘর পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে অসবর্ণবিবাহ বলতে কেবল সম্প্রদায়গত অমিলকেই বোঝায় না, মানসিকভাবে যেসব নারী-পুরুষ ভিন্ন তাদেরকেও বোঝায়। এই অসবর্ণবিবাহই হয়েছিল *যোগাযোগ* উপন্যাসের মধুসূদন আর কুমুদিনীর মধ্যে। লক্ষণীয়, মধুসূদন কুমুকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বন্ধ করতে চেয়েছিল বলেই কুমু প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এখানেই কুমু চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। কুমুকে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করছিলেন তাঁর সবটুকু রোমান্টিক পক্ষপাতিত্ব দিয়ে। তবে পুরুষতন্ত্রের কাছেই পরাজয় ঘটে কুমুর। বিশেষ করে মাতৃত্বের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তারপরেও তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কুমুকে এক নীরব প্রতিবাদী হিসেবে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে স্থান দিয়েছেন।

চতুরঙ্গ (১৯১৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক জীবনরহস্যআবৃত 'দামিনী' নামের এক নারীচরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। শচীশ-দামিনীর প্রেমের এক বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েনে আবহমান বাংলার সহজিয়া সাধনার পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমচেতনার যুগপৎ প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

দামিনীকে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন দ্রোহ আর সৌন্দর্যের রং দিয়ে :

> বিধবা দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ। অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের বিধবা দামিনী যেন সত্যই আকাশের দামিনী ঝলক। সে উত্তুরে বাতাসকে কখনো ভয় করে না, সে কামনাময়ী নারী। প্রবৃত্তিকে পাশ কাটিয়ে নয়—প্রবৃত্তির মাথা মাড়িয়ে হেঁটে যাওয়াতেই তার যেন অনন্ত সুখ। তাই মৃত্যুর আগে স্বামী শিবতোষ তাকে লীলানন্দ স্বামীর হেফাজতে দিয়ে গেলে সে তা মেনে নেয় না। সংরাগদগ্ধ সে বিদ্রোহ করে। ধর্ম সাধনার নিরস সাধনা নয়—পুরুষ হৃদয়জয়ের রসময় সাধনা তার। তাই লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য শচীশকে কামিনী দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, প্রেম দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল। দামিনীর চাওয়া খুব স্পষ্ট।[১০] কিন্তু শচীশের ধাত আলাদা, জাত হিসেবে সে ভিন্নতর জগতের মানুষ। তাই শচীশ দামিনীকে ভালোবেসেও গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু শচীশের ভালোবাসার মধ্যেও কোনো খুঁত ছিল না। আর সেজন্যই বোধহয় বারবার ব্যর্থ হয়েও শচীশকে সে হৃদয় থেকে বিদায় করতে পারে নি। আর এ না-পারাটাই দামিনী-চরিত্রের দুর্বিষহ ট্র্যাজেডি। তাই বাধ্য হয়ে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে দামিনী। সেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে কেন্দ্র করে শচীশ-দামিনী প্রেমলীলার সবটুকুই শ্রীবিলাসের জানা। শ্রীবিলাস ছিল শচীশ-দামিনী প্রেমের নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। তাই দামিনীর কাছে বরাবরই সে গৌণ।

এই গৌণ চরিত্র শ্রীবিলাসকে দামিনী যেদিন বিয়ে করল, সেদিন সে সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং অসহায়। শচীশের হৃদয় থেকে বিতাড়িত দামিনীর এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। আর সে জন্যই

---

[১০] সোহরাব হোসেন, "বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নারী চরিত্র"। দ্র. ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ৫৪৫

শ্রীবিলাসের সংসার করেও দামিনী ছিল বিরহিনী। দামিনী যেদিন শচীশের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়, সেদিন শচীশকে উদ্দেশ্য করে শ্রীবিলাস কিছু কথা বললে দামিনী রাগ করে বলেছিল :

> দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান! তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই?

দামিনীর শচীশের প্রতি এই প্রেমও রবীন্দ্রনাথ সংসার ধর্মের কাছে গৌণ করে দেন। যে দামিনী উপন্যাসে তার নারীত্ব নিয়ে যতটা উজ্জ্বল ও বিতর্কিত, সতীত্ব নিয়ে ততটা ছিল না, সে দামিনীই সমুদ্রতীরে মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রেমিকার ভাষায় দ্বিতীয় স্বামী শ্রীবিলাসকে বলল : "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" উপন্যাসের কাহিনিও এভাবে শেষ হয়।

দামিনী চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন নারীর আর এক বিশ্বরূপ : "বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। সে জীবনরসের রসিক।" রসিক এই নারীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাই ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও যৌন স্বাধীনতাবোধের অনিবার্য প্রকাশ। যে কারণে দামিনী নিঃসংকোচে বলতে পারে :

> আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেভানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকেই চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। [...]
>
> তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।

দামিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর প্রেম ও যৌনশীলার অস্তিত্বকে নারীত্বের অনিবার্য অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং সেই সত্যই তৎকালীন সমাজে প্রচার করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমাঞ্চ-আশ্রিত উপন্যাস *শেষের কবিতা* (১৯২৯)। অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান এ কাহিনির প্রধান উপাদান। এ উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের আর এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল নায়িকা লাবণ্য। অমিত রায়ের সঙ্গে প্রেমপর্বের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতিতে বিবাহপর্বে প্রবেশের ঠিক পূর্বেই একদিকে কেটি মিটারের আবির্ভাব, অন্যদিকে শোভনলালের। পরিণামে লাবণ্য-শোভনলাল ও অমিত-কেটি মিটার বা কেতকীর পুনর্মিলন।

এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসারী এক নারী লাবণ্যকে সৃষ্টি করেছেন। অভিজ্ঞতা ও বেদনাময় চৈতন্যজাগ্রত লাবণ্য তার প্রেমের চিরন্তনতা, সজীবতা, স্বতঃস্ফূর্ততাকে চিরঞ্জীব করে রাখার জন্য অমিতের বিবাহপ্রস্তাবকে অস্বীকার করে। কারণ সে জানে 'সংসারে সংকীর্ণ

পরিসরে চিরদিনের সপ্তপদী গমন অসম্ভব।' জীবনের ঝোড়ো পথ অতিক্রম করে লাবণ্য জীবনের অর্থকে এইভাবেই বোঝে।[১১] তাই সে অমিতকে বলে :

> ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না। এ নিজেকে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পেছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কি কিছু দেবার আছে?

অমিতকে ফিরিয়ে দিয়ে লাবণ্য তার কাছে হয়ে থাকল 'ভালোবাসার দিঘি', 'ঘরে আনবার নয়'; যাতে কেবল সাঁতার কাটা যায়। তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই লাবণ্য রোমান্টিকতা-অভিসারী যেকোনো পুরুষের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে—যার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর ভাবনার এই নারী শোভনলালের সংসারের শত বন্ধন একদিকে রেখে, অমিতের প্রেমের মুক্তসাগরে অবগাহন করে বলতে পারে :

তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান।
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

লাবণ্যের প্রেমানুভূতির দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার এই রীতি, বাংলা সাহিত্যের নায়িকা-চরিত্রের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

চার অধ্যায় (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাস প্রকাশের পর 'কৈফিয়ত' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জানান : "যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা! নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, নির্ভর করে চারিদিকের অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপরও। নদী আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্তের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছে।"

এলা চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করেছেন যুক্তিবাদী ও আধুনিক মন আর বিজ্ঞানবাদী চেতনা। এই এলা জানে, নারীজাতি আর পুরুষজাতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টতই শারীরবৃত্তীয়। যে-কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব না-রেখে যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলেই পেয়ে যাবে নিজের আসন। রবীন্দ্রনাথ এলার কণ্ঠে তাই জানান :

[১১] সুস্মিতা সোম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

> নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্ত। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।

রবীন্দ্রনাথ এলা চরিত্রের মধ্যে অরূপরতন প্রেমের সন্ধানের পাশাপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আদর্শ নারীর মনন প্রতিষ্ঠা করতেও ভোলেন নি। তাই অতীন্দ্রের প্রতি এলার প্রেমচেতনা বিশেষ থেকে সার্বিকে উন্নীত হয়ে ওঠে :

> তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্ত। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।

এলাকে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি, বুদ্ধি, প্রগতি আর দেশপ্রেমের চেতনা দিয়ে অসাধারণ নারীতে পরিণত করলেও সে যে নারী সে-সত্যকে এড়িয়ে যান নি। তাই উপন্যাসের শেষে এলা সব দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে ব্যক্তি-প্রেমের সেই শান্ত-সৌম্য ধারণার কাছে ফিরে আসে। তখন অতীন্দ্রের প্রেম এলার জীবনে একান্তভাবে কাঙ্ক্ষনীয়; তার দেশ আর আদর্শের চেয়েও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর মতামত দেন :

> একদল বুদ্ধিমান বিবেচনাশক্তিবিশিষ্ট জীবকে কত কত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকারের শাসন-পীড়ন দমন বন্ধ করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জীব বশীভূত সংকুচিত সংকীর্ণমন করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।... এ যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যাও পাপ নয়।... মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এসে বোঝা যায়।

এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের কয়েকটা নারীচরিত্রের মাধ্যমে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে 'নষ্টনীড়' ও 'স্ত্রীর পত্র'।[১২]

নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের একটি যথার্থ অর্থ আছে, তা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক অধিকারের সমতা, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্ব অর্থে তার অন্তরায় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়েই সমাজশাসিত মানুষের মন অনেক সময় এতটাই সংকীর্ণমনা ও পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে যে বিয়ে নামক বিষয়টির মধ্যে যে মাধুর্য ও আত্মিক সম্পর্ক থাকার কথা তা কর্পূরের মতো নিঃশেষিত হয়ে যায়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক তখন একটা অভ্যাসের ব্যাপার, বিয়ে একটা মূল্যবোধের পুরাতন দায়, একটি রীতিমাত্র, আর নারী সেখানে পোষা প্রাণী ছাড়া কিছু না। এ-রকমই একটা গল্প রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪)। যেখানে নায়িকা মৃণাল পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; নারীর

[১২] সৈয়দা নাজনীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

প্রতি স্বামীর পরিবারের অবহেলা, সংসারের সিদ্ধান্তে স্ত্রীর অংশগ্রহণকে মেনে না-নেওয়া, ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিবাদ করেই সংসার ছেড়ে চলে যায়। এই চলে যাবার সিদ্ধান্ত পত্রের মাধ্যমে সে তার স্বামীকে জানায়।

এই গল্পে মৃণাল গ্রামের মেয়ে হয়েও আধুনিক, রুচিশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তার প্রখর যুক্তিবোধ আর বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছে সে কেবল মেয়েমানুষ নয়, মানুষও বটে। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তারও আছে। তাই তার পত্রকে পুরুষবাদী মনোভাবে বিশ্লেষণ করলে তাকে বিদ্রোহী মনে হবে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে এটাই স্বাভাবিক। মৃণালের পত্রের খানিক অংশ লক্ষ করা যাক :

> আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়। [...]
>
> তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।
>
> আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

রবীন্দ্রনাথ মৃণাল চরিত্রকে স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সঙ্গে নারীরও যে সৃজনশীল প্রতিভা থাকা স্বাভাবিক সে সত্যও উন্মোচন করেছেন মৃণালের মধ্যে। এবং এই গুণ তার নিজস্ব আর স্বাধীন। দৃষ্টান্ত :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় মৃণাল চরিত্রের স্নিগ্ধ, কোমল, নীরব আর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'নষ্টনীড়' (১৯০২) গল্পে নারীর প্রতি পুরুষের অবহেলা আর অগ্রাহ্য করার যে ছবি তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তা সত্যিই নির্মম আর অমানবিক[১৩] :

> এইরূপে সে (ভূপতি) যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত-গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।
>
> ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফল পরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।
>
> এমন অবস্থায় সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

এখানে চারুলতার স্বামী ভূপতি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে তৎপর কিন্তু স্ত্রীর প্রতি যে অবহেলা দেখানো হচ্ছে তা তার মনেই আসে নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী এভাবেই অবদমন করে সময় কাটায়। চারুলতা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

চারুলতার জৈব অস্তিত্বকে গ্রাহ্য না-করে শুধু সময় কাটানোর জন্য অমল গল্পে উপস্থিত হলেও এক পর্যায়ে অমলও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে চারুলতাকে ছেড়ে চলে যায়। যদিও অমল-চারুলতার প্রেম নিষ্কাম, তারপরেও ভূপতির মনে পুরুষতন্ত্রের সন্দেহ : "অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িতে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে, চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।" চারুলতা এভাবে দুই পুরুষের কাছ থেকেই পরিত্যক্ত হলো। নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে এভাবেই বঞ্চিত ও নিঃসঙ্গ। চারুলতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি নারীর অবদমন আর মানসিক নির্যাতনের বাস্তব সত্য রূপায়িত করেছেন। পুরুষতন্ত্রের এরকম নিষ্ঠুর চিত্র বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল।

'মানভঞ্জন' (১৮৯৫)-এর "গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।"—এই গিরিবালার প্রতিও স্বামী গোপীনাথের আকর্ষণ নেই, নেই ভালোবাসা। বিশেষ করে গোপীনাথের বাবার মৃত্যুর পর যখন সে স্বাধীন হয়ে বাড়ির কর্তা হলো।

---

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯

নারীর ভেতর প্রতিশোধ নেবার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে, সে ক্ষমতা কখনো কখনো পুরুষতন্ত্রের অর্গল ভেঙে দিতে পারে—সে সত্যই রবীন্দ্রনাথ জানান দেন গিরিবালা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। স্বামী গোপীনাথ গান্ধর্ব থিয়েটারের 'মনোরম' নাটকের নায়িকা লবঙ্গকে নিয়ে পালিয়ে গেলে গিরিবালা এ গ্রন্থে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> ...ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাঁধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "গিরিবালা" "গিরিবালা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেইজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

'মানভঞ্জন'-এর এই গিরিবালা অভিনব পন্থায় স্বামীর অবহেলার প্রতিদান দিয়েছে। নারীকে স্ত্রী নাম দিয়া সংসারে নিষ্ক্রিয় করে রাখার পুরুষতান্ত্রিক এই নিয়মের বেদীকে গিরিবালা এক দুঃসাহসী প্রতিবাদে ভেঙে দিয়েছে। গিরিবালা এক অনন্য প্রতিবাদী নারী হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে।

'মহামায়া' (১৮৯২) গল্পের নামচরিত্র মহামায়া কুলীন ঘরের এক রহস্যময় নারী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "মহামায়া কুলীন ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।"

রাজীব অকুলীন ব্রাহ্মণ মহামায়াকে ভালোবাসে। মাহামায়াও রাজীবকে ভালোবাসে। কিন্তু সমস্যা কুলীনত্ব নিয়ে। এক পর্যায়ে মহামায়ার বড়ো দাদা ভবানীচরণ জোর করে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহামায়াকে শ্মশানে নিয়ে বিয়ে দেয়। বৃদ্ধা মারা গেলে মহামায়াকে সহমরণ দেয়া হয়। দৈবক্রমে মহামায়া বেঁচে যায়। এই বেঁচে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহামায়া চরিত্রে রহস্য আর আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার আরোপ করেছেন। যা কুলীন সমাজের প্রতি এক সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা। অবশ্য এই বিদ্রোহের পেছনে ছদ্মবেশ রয়েছে। মহামায়া চরিত্রে আভিজাত্য আর কুলীনত্বের দাম্ভিক আর কর্তৃত্বপরায়ণ মেজাজ গল্পের সূচনাতেই লক্ষণীয়।

> মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, 'তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়া তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?'
>
> রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটো কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা-কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, 'আমি প্রস্তাব করিতেছি,

> এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।' রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মন মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না।

নারী তার রূপ আর ব্যক্তিত্বে কতটা প্রখর হতে পারে মহামায়া চরিত্র তার প্রতিরূপ। এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পুরুষতন্ত্রের প্রতি কঠোর বিরোধী মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে পুরুষতন্ত্রের নানামুখী নির্যাতন, শোষণ, শাসনের পটভূমির মধ্যে দিয়েও বেশ কিছু নারীচরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে 'মধ্যবর্তিনী' (১৮৯৩) গল্পের হরসুন্দরী অসাধারণ সংযমী, ত্যাগী আর কল্যাণী এক নারী। 'দিদি' (১৮৯৪) গল্পের শশী চরিত্র নারীত্ব আর মাতৃত্বে রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে এক অদ্বিতীয় নারী। 'শাস্তি' (১৮৯৩) গল্পে ছোটবউ চন্দরা পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রবল ক্ষোভ আর আত্মত্যাগে সংসারধর্মত্যাগী এক নারী।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলো আধুনিক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল অথচ গৃহী চেতনালব্ধ। এরাই আবার শুভ মূল্যবোধকে ধারণ করে কল্যাণী আর স্নেহময়ী। নারী অধিকার, নারীত্ব সংরক্ষণ, মাতৃত্বে এরাই অনন্য। সেই সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্যের চারিত্র্যে প্রাগ্রসর আর চিরনতুন। আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মগরিমায় উজ্জ্বল রবীন্দ্রসৃষ্ট এই নারীরা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে এখনো অনুকরণীয় আর অনুসরণীয়।

মাসুদুল হক সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, দিনাজপুর সরকারি কলেজ। masudul.hoq@gmail.com।